সূচিপত্র

চাইল্ড অ্যাবিউজ	১৩
শিশুদের শাস্তি দেওয়া	২২
জীবন কখনো পশ্চাৎমুখী নয়	২৬
পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ 'শিশু হওয়া'	২৮
শিশুর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ	৩১
আমার আম্মু একটুও সুন্দর নন	৩৪
শিশুদের প্রশ্ন করা	৩৬
শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা	৩৮
বেস্ট অব দ্য উইক	৪১
শিশুদের এইম ইন লাইফ	৪৪
শিশুদের বিনোদন ও খেলাধুলা	৪৬
শিশুদের গড়ে তোলা	৪৯
শিশুরা যখন অভিভাবক	৫১
শিশুদের ডায়েরি লেখা	৫৩
আয়নার প্রতিচ্ছবি	৫৫
শিশুদের নিয়মানুবর্তিতা	৫৮
শিশুদের কাউন্সেলিং	৬০

শৈশবেই বুনে দিতে হবে কল্যাণকামিতার বীজ	৬৪
শিশুদের মনে আল্লাহর অবস্থান	৬৬
শিশুদের আত্মসমালোচনার আলোকে গড়ে তোলা	৭০
খুব অসহায় লাগে যখন	৭৩
প্রতিটা ঘটনা-দুর্ঘটনা দিয়ে যায় শিক্ষা	৭৬
চলুন শিখি শিশুদের কাছ থেকে	৭৮
শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে জ্ঞানপিপাসা	৮০
মা-ছেলের খুনশুটি	৮৩
শিশুতোষ নাটিকা : ছোট্ট যোদ্ধা	৮৬
গল্পে গল্পে বাচ্চাদেরকে শেখানো	৯০
একটি শিশুর আত্মকথা	৯৪
শিশুদেরকে চাপিয়ে না দিয়ে বোঝাতে হবে	১০৯
গল্পে গল্পে শিশুদের কুরআন শেখা	১২০
গল্পে গল্পে শিশুদের হাদিস শেখা	১২৬
একটি পানির বোতল, গ্লাস এবং কিছু উপলব্ধি	১২৯
সহানুভূতি	১৩৩
একটি মুরগির আত্মকথা	১৩৭
ভালোবাসার শিক্ষা	১৪৭
স্কুলব্যাগ	১৫০
ভালো ও মন্দের ব্যাপারে শিশুদের দৃষ্টি উন্মোচন	১৫৩
সারপ্রাইজ	১৫৭
পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও আমার পুত্র	১৬০
গোল্ডেন ওয়ার্ড—সরি	১৬৪
গোল্ডেন ওয়ার্ড—লাভ ইউ	১৬৬
গোল্ডেন ওয়ার্ড—থ্যাংক ইউ	১৬৮
হেলদি মিথ্যা	১৭০

শৈশবেই বুনে দিতে হবে কল্যাণকামিতার বীজ	৬৪
শিশুদের মনে আল্লাহর অবস্থান	৬৬
শিশুদের আত্মসমালোচনার আলোকে গড়ে তোলা	৭০
খুব অসহায় লাগে যখন	৭৩
প্রতিটা ঘটনা-দুর্ঘটনা দিয়ে যায় শিক্ষা	৭৬
চলুন শিখি শিশুদের কাছ থেকে	৭৮
শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে জ্ঞানপিপাসা	৮০
মা-ছেলের খুনশুটি	৮৩
শিশুতোষ নাটিকা : ছোট্ট যোদ্ধা	৮৬
গল্পে গল্পে বাচ্চাদেরকে শেখানো	৯০
একটি শিশুর আত্মকথা	৯৪
শিশুদেরকে চাপিয়ে না দিয়ে বোঝাতে হবে	১০৯
গল্পে গল্পে শিশুদের কুরআন শেখা	১২০
গল্পে গল্পে শিশুদের হাদিস শেখা	১২৬
একটি পানির বোতল, গ্লাস এবং কিছু উপলব্ধি	১২৯
সহানুভূতি	১৩৩
একটি মুরগির আত্মকথা	১৩৭
ভালোবাসার শিক্ষা	১৪৭
স্কুলব্যাগ	১৫০
ভালো ও মন্দের ব্যাপারে শিশুদের দৃষ্টি উন্মোচন	১৫৩
সারপ্রাইজ	১৫৭
পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও আমার পুত্র	১৬০
গোল্ডেন ওয়ার্ড—সরি	১৬৪
গোল্ডেন ওয়ার্ড—লাভ ইউ	১৬৬
গোল্ডেন ওয়ার্ড—থ্যাংক ইউ	১৬৮
হেলদি মিথ্যা	১৭০

চাইল্ড অ্যাবিউজ

পৃথিবীর সব বাবা-মা সন্তানের ভালো চান। সন্তান যাতে ভালো হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। শিশুদের আচরণগত বৈচিত্র্যের চেয়েও বেশি দেখেছি বাবা-মায়েদের বৈচিত্র্যময় আদর, সোহাগ, ভালোবাসা ও শাসন। জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না বুঝে বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের ওপর নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। শারীরিক আঘাত চোখে দেখা যায়, ফলে বাবা-মা তাতে মলম লাগাতে পারেন বা চেষ্টা করেন; কিন্তু মানসিক আঘাত!

এই আঘাতের কারণেই শিশুদের মানসিকতার সঠিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। যেখানে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তারা বস্তুগত গুণাবলি ও ঘটনা সম্পর্কে ধারণা বা উপলব্ধি লাভ করে। এর ওপর নির্ভর করেই তাদের মধ্যে জন্ম নেয় স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও বিচারবুদ্ধি।

আমার পরিচিত একটি বাচ্চা আছে, সে কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারে না, স্থির হয়ে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, কিছু করতে বললে সব এলোমেলো করে ফেলে, সামান্যতেই রাগ করে কান্না জুড়ে দেয়। একটু বেখেয়ালি স্বভাবের, তাই খুব বেশি ভুল করে।

বাচ্চাটির বাবা-মাকে যদি ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, তাহলে তারা দুজনই ভীষণ বিরক্ত হন এবং রাগ করেন। মোটকথা তারা মানতেই রাজি নন, তাদের বাচ্চাটি এডিডি বা অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিজ-অর্ডারের শিকার। কেউ বোঝাতে গেলে উলটো তাদের সাথে মনোমালিন্য হয়। অথচ সন্তানের প্রতি তাদের ভালোবাসার কোনো কমতি নেই। বাচ্চা যা চাইছে, বলার

সাথে সাথে তা সামনে এনে হাজির করছেন। কিন্তু মানুষ বলবে, 'তাদের বাচ্চাটা স্বাভাবিক না'—এ ভয়ে বাচ্চাকে তারা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান না বা বিষয়টি নিজেরাও মানতে চান না। প্রতিবেশী একজনকে দেখেছি, বাচ্চা কিছু করতে না চাইলে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে তাকে সে কাজটি করতে বাধ্য করেন। কেউ কেউ সারাক্ষণ টিভি চ্যানেল আর ফোনালাপ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন, বাচ্চা কাছে এসে কথা বলতে চাইলেও ধমক দিয়ে অন্যদিকে পাঠিয়ে দেন।

একজন মাকে দেখেছি, বাংলাদেশ থেকে জালিবেত নিয়ে এসেছেন নিজের পাঁচ বছর বয়সি মেয়েকে শায়েস্তা করার জন্য।

এক মা বুকফাটা কান্নার সাথে জানিয়েছেন, তার সাত বছর বয়সি ছেলেটাকে তার স্বামী সামান্য কারণেই মাথায় তুলে সোফা বা বিছানায় ছুড়ে ফেলেন, কখনো লাথি পর্যন্ত মেরে বসেন।

যেকোনো ধরনের আচার-ব্যবহার বা কাজ—যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বা ভালো থাকায় বাধা দেয়, তাকেই এককথায় 'চাইল্ড অ্যাবিউজ' বলে। চাইল্ড অ্যাবিউজকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—

» ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ : যেকোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণহীন শারীরিক আঘাত।

» সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ : শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যেকোনো ধরনের যৌন সংসর্গ।

» বিহেভিয়ার অ্যাবিউজ : শিশুর প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগিতা।

» ইমোশনাল অ্যাবিউজ : নানাভাবে শিশুকে কোনো কিছুতে বাধ্য করা।

এই প্রত্যেকটি কারণেই শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

চাইল্ড ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ

সন্তানদের ভালোর জন্য প্রয়োজনে বাবা-মাকে দৃঢ় হতে হয়। এটা অবশ্যই ভালো বিষয়। বাবা-মায়ের দৃঢ়তা সন্তানদের মনে নিরাপত্তাবোধ জন্ম দেয়। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যখন কথা শোনে না বা অবাধ্যতা করে, তখন তাদেরকে সঠিক পথে আনতে বাবা-মায়েরা যে কাজটি করেন, তার নাম 'শাসন'। শাসন বলতে সবাই বোঝে—বকাঝকা করা, শারীরিক শাস্তি দেওয়া বা পছন্দের জিনিস দেওয়া বন্ধ করা। শাসনের পক্ষে বাবা-মায়েদের কাছে নানা ধরনের যুক্তি থাকে। যেমন : মাঝে মাঝে শাসন না করলে বাচ্চারা মানুষ হয় না, সাহস বেশি বেড়ে যায়, ছোটবেলায় আমাদের

বাবা-মায়েরাও আমাদের শাসন করেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ শাসন আর গায়ে হাত তোলা কিন্তু এক নয়। বাচ্চাদেরকে তাদের ভুল বা অন্যায়গুলো অবশ্যই ধরিয়ে দিতে হবে, তবে এর সাথে গায়ে হাত তোলার কোনো সম্পর্ক নেই।

একবার আমি দেখেছিলাম, মেহমানদের জন্য সাজিয়ে রাখা খাবার ধরার কারণে আড়াই বছর বয়সি একটি মেয়েকে তার বাবা ঘরভরতি মানুষের সামনে চড় লাগিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটি তারপর নিষ্পাপ দৃষ্টিতে বাবার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, কেন তাকে চড় দেওয়া হয়েছে, সে তা বুঝতে পারছে না।

এমনও হয়, বাসায় টিচার এলে বাচ্চা পড়তে চায় না, তাই চার বছর বয়সি মেয়েকে মা টিচারের সামনেই লাঠিপেটা শুরু করে দেয়।

স্কুল থেকে ডেকে টিচাররা যদি অভিযোগ করে বলেন—আপনার বাচ্চা ক্লাসে অমনোযোগী থাকে। তাহলে আর দেখে কে! বাসায় ফিরেই চড়-থাপ্পড়ের বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় বাচ্চাটার ওপর।

ছয় বছরের ছেলেটা তার তিন বছর বয়সি বোনের সাথে খেলনা শেয়ার করতে রাজি না হলেই তাকে শারীরিক আঘাতের শিকার হতে হয়।

ঘরের কোনো জিনিস নষ্ট করলে তো আর রক্ষা নেই!

এমন আরও অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে বাচ্চাদের সাথে। অথচ এই ব্যাপারগুলো সমাধানের সাথে শারীরিক আঘাতের কোনো সম্পর্ক নেই। শারীরিক আঘাত এর সমাধানও নয়।

পরীক্ষায় নম্বর কম পেলে, ঘরের কোনো জিনিস নষ্ট করলে, ছোট ভাই বা বোনের সাথে বনিবনা না হলে, কথা শুনতে না চাইলে, অবাধ্যতা ইত্যাদি করলে আমাদের দেশে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলার বদলে গায়ে হাত তোলার যে সংস্কৃতি প্রচলিত আছে, এতে আসলে তেমন কোনো লাভ হয় না। এর দ্বারা বরং বাচ্চারা শুধু শরীরে ব্যথা পায়; কিন্তু কেন ব্যথা পেল তা বুঝতে পারে না। ফলে একই কাজ বারবার করে এবং বারবার শাস্তি পায়। এর ফলে বাচ্চাদের মনে বাবা-মায়ের প্রতি চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তারপর একটা সময় অতি আদরের বাচ্চাটি তার বাবা-মায়ের কথাই সহ্য করতে পারে না আর। তাদের স্বভাবে ও আচরণে এমন পরিবর্তন আসে, এরপর থেকে তারা ইচ্ছে করে কথা শোনে না বা দুষ্টুমি করে। কারণ তখন তার চিন্তা থাকে—খুব বেশি হলে আমাকে ধরে পিটুনি দেওয়া হবে, এই তো!

তাই বাচ্চারা কোনো অন্যায় করলে তাদের বোঝাতে হবে। কেন এই কাজটা

করা ঠিক নয়, এর প্রভাব কী হতে পারে—ইত্যাদি শেখাতে হবে। মনে রাখবেন, শারীরিক আঘাতের চেয়ে শিশুকে বোঝানোটা অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

শাসন আর অ্যাবিউজ কিন্তু এক জিনিস নয়। শাসন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শিশুর ভুল বা অন্যায়গুলো ধরিয়ে দিয়ে তাকে তা থেকে বের হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, শাসনের নামে আমাদের বাচ্চারা প্রতিনিয়ত অ্যাবিউজের শিকার হচ্ছে, যার ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের সুষ্ঠু বিকাশ।

বাবা-মা শাসন করতে গিয়ে বাচ্চাদের গায়ে হাত তুললেই যে সব ঠিক হয়ে যায়, ব্যাপারটা মোটেও এমন নয়; বরং এর ফলে তারা আরও জেদি হয়ে ওঠে। যারা বাচ্চাদেরকে বোঝাতে পারেন না বা শেখাতে পারেন না, তারাই আসলে শাসনের নামে গায়ে হাত তোলেন। কিন্তু এভাবে সন্তানদের মানুষ করা যায় না। অনেকে নিজেদের চরিত্রের অযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রণহীনতাকে শাসনের নামে চালিয়ে দেন, যা প্রকৃত অর্থে চাইল্ড ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ।

সামান্য কারণে যে বাচ্চাটার গায়ে আমি হাত তুলছি, তার শরীরের সাথে সাথে ছোট্ট মনটাকেও কিন্তু আঘাতে জর্জরিত করে ফেলছি! যখন তার স্নেহ, মমতা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন ও পাচ্ছে শাসনের নামে চড়-থাপ্পড় ও বকাঝকা!

একটা বয়সে গিয়ে যখন আমার নিজের স্নেহ, মমতা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা প্রয়োজন হবে, তখন কি সন্তানের কাছ থেকে সেটা আমার প্রাপ্য মনে করাটা অন্যায় হবে না? আমার আজকের আচরণই আমার সন্তানের আগামীর পাথেয়—এ বিষয়টি যেন আমরা ভুলে না যাই।

চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ

চাইল্ড অ্যাবিউজ নিয়ে কথা বলছিলাম প্রতিবেশী কয়েকজন ভাবির সাথে। সবাই চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এক ভাবি আবার ফিরে এলেন। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম, কিছু বলতে চান। বেশ সময় নিলেন তিনি নিজেকে গুছিয়ে নিতে। তারপর বললেন, ভাবি, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের বাসায় আমার দূরসম্পর্কের এক মামা থাকতেন। তিনি আমাকে খুব আদর করতেন, জড়িয়ে ধরতেন, আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতেন! এসব কি তাহলে অ্যাবিউজ ছিল? আমি তো তখন অনেক ছোট ছিলাম। মাত্র আট বছর বয়স ছিল। বেশিরভাগ সময় আড়ালেই করেছেন। তবে মাঝে মাঝে আব্বু-আম্মুর সামনেও আমাকে আদর করে

পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ 'শিশু হওয়া'

গতকাল বিকেলে এক ভাবির বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় বিভিন্ন প্রফেশনে 'কঠিনতার' প্রসঙ্গ উঠল। আলাপের একপর্যায়ে ভাবির ১০ বছর বয়সি ছেলেটি হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তোমরা সবাই ভুল বলছ। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো 'শিশু হওয়া'। আমরা সবাই ঘুরে বাচ্চাটির দিকে তাকালাম। সে একটুও দমে না গিয়ে বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমার কথার স্বপক্ষে আমি অনেক যুক্তি দিতে পারব।

তাকে তখন যুক্তি দেখানোর অনুমতি দেওয়া হলো। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সে নিজের মতো করে বলতে শুরু করল—একটা শিশুকে যে কঠিন কঠিন কাজগুলো নিয়মিত করতে হয়, বড়দেরকে কখনোই তার কিছু করতে হয় না। শিশুদেরকে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই স্কুলের জন্য তৈরি হতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও নাস্তা খেতে হয়। দেরি হলে আম্মু বকা দেন। আর স্কুলে যাওয়ার পর তো শুধু কাজ আর কাজ—অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞান, অঙ্কন, এক্সারসাইজ ক্লাস—একটার পর একটা চলতেই থাকে। এক ঘণ্টার ব্রেক, তবুও টিচার সারাক্ষণ আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেন। দুষ্টুমি করলে শাস্তি দেন। বাসায় ফিরতে না ফিরতেই আবার শুরু হয় গোসল, খাওয়া, এক ঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর বসে বসে হোমওয়ার্ক করা, দেড় ঘণ্টা খেলা করা, বিকেলে নাস্তা করা। আবার পড়তে বসা। কুরআন, জেনারেল নলেজ আরও কতকিছু শেখা! সারাক্ষণ একটার পর একটা করতেই থাকা। কোনো কিছু করতে একটু দেরি হলেই বড়রা চিৎকার শুরু করেন। তাদের ধারণা—শিশুরা মানুষ নয়; গাড়ি। তাদের কাজ শুধু ছোটাছুটি করা।

ওর কথা শুনে আমরা নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। কী বলব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নিজের শৈশবকে ঘিরে একটা শিশুর এতটা অভিমান সত্যিই

অবাক করার মতো। শিশুদের মনে নানা কারণে অভিমান তৈরি হয়। আর এইসব অভিমানের সূত্রপাত ঘটে যখন তাকে কোনো কিছু বুঝিয়ে না বলে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ধরা যাক, শিশু একটা জিনিস চাইছে, এখন সেটি কেন তাকে দেওয়া যাবে না, সেটা যদি বুঝিয়ে বলা হয়, তাহলে তার মনে অভিমান জন্মায় না। কিন্তু বুঝিয়ে না বলে যদি কঠোরতার আশ্রয় নেওয়া হয় কিংবা তার চাওয়াটাকে গুরুত্ব দেওয়া না হয়, তাহলে শিশুর মনে অভিমান জন্ম নেয়।

আমি বাচ্চাটিকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?

জবাবে সে বলল, আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।

'ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য তোমাকে কী করতে হবে?'

'বেশি বেশি পড়াশোনা করতে হবে।'

'পড়াশোনা করার জন্য কোথায় যেতে হবে?'

'স্কুলে যেতে হবে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার স্কুলে যাওয়ার কারণ হলো নিজের স্বপ্ন পূরণ করা। এখন যদি তুমি না খাও, তাহলে শক্তি পাবে কীভাবে? আর শক্তি না পেলে পড়াশোনা করবে কীভাবে?

তার অভিযোগের প্রতিটা বিষয় 'কেন সে করে' বা 'কেন তাকে করতে হয়' প্রশ্ন করে করে তার মুখ দিয়েই বলালাম। তখন ও বলল, আম্মু তো আমাকে এভাবে বুঝিয়ে বলেননি, তাই আমি বুঝতে পারিনি। এখানেই মূল সমস্যা। আমরা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলার চাইতে বেশিরভাগ সময় হুকুম করতে পছন্দ করি, যার ফলে বাচ্চারা বুঝতে পারে না, সে যা করছে বা তাকে দিয়ে যা করানো হচ্ছে, এতে মূলত তারই উপকার হচ্ছে। আর এই না বোঝাটাই বাচ্চার মনে রাগ, ক্ষোভ, অভিমান জন্ম দেয়।

আমার ছেলের অভিযোগ ছিল—প্রতিদিন কেন কুরআন পড়তে হবে? একদিন না পড়লে এমন কী ক্ষতি?

তখন ওর বাবা ওকে 'দাদু আর নাতির' গল্পটা শুনিয়ে বললেন—একটা ছোট্ট ছেলে তার দাদার সাথে থাকত। দাদা প্রতিদিন ভোরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ছেলেটি সর্বদা দাদাকে অনুসরণ করতে চাইত; কিন্তু কুরআনের কিছুই সে বুঝত না। তাই একদিন দাদাকে বলল, দাদা আমি তো কুরআনের কিছুই বুঝি না, প্রতিদিন কেন তাহলে কুরআন পড়ছি? চুল্লিতে কয়লা তোলা বন্ধ করে দাদা বললেন, এই

শিশুর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ

কয়েকদিন আগে এক বাসায় দাওয়াত থেকে ফিরে এসে আমার কাজিন ঘোষণা দিল—ওই বাসায় জীবনেও আর যাবে না। কারণ জানতে চাইলে বলল, বাচ্চারা দুষ্টুমি করার সময় একটা শোপিস পড়ে ভেঙে যাওয়াতে মেজবান ভাবি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন কথার ফাঁকে অন্য ভাবিদের পরামর্শ দিয়েছেন, যেন তারা তাদের বাচ্চাদেরকে ভদ্রতা শেখাতে উদ্যোগী হন। এতে উপস্থিত সবাই কমবেশি অপমানিত বোধ করেছেন।

সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদেরকে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে যখন সাথে বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হয়, তখন অনেক সময় আপনাতেই মেহমান ও মেজবানদের মধ্যে সূক্ষ্ম ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়ে যায়। শিশুরা স্বভাবতই দুরন্ত ও চঞ্চল। কিছু কিছু শিশু তো মাত্রাতিরিক্ত ছটফটে। একমুহূর্তের জন্যও স্থির থাকতে পারে না; সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে বেড়ায়। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নানান মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেলে। এতে আনন্দঘন পরিবেশ অনেক সময় থমথমে রূপ নেয়। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো—শিশুদের দিয়েই শিশুদের বোঝানোর কাজটা করিয়ে নেওয়া।

আমার বাসায় সবচেয়ে মূল্যবান বলতে যা আছে, তা হলো বই। আমার ছেলে যখন হাঁটতে শেখে, তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল সেলফ থেকে বই নামানো আর ওঠানো। আমি এদিক থেকে ওদিক ফিরলেই ফট করে বই থেকে পৃষ্ঠা ছিঁড়ে মুখে পুরে ফেলত।

'কী করা যায় ছেলেকে নিয়ে'—জানতে চাইলে তার বাবা হেসে বললেন, এক কাজ করো, ভক্ষককে রক্ষক বানিয়ে ফেলো। 'রাজকন্যা আর রাক্ষসের গল্প' জানা থাকার কারণে আমার ছেলে জানত, রাক্ষসের প্রাণ থাকে সাগরের গভীর নিচে এক

নীল ভোমরার ভেতর। ওকে বললাম, রাক্ষসের প্রাণ যেমন ভোমরার ভেতর লুকানো থাকে, আম্মুর মনও তেমন এই বইয়ের ভেতর লুকানো আছে। চোখ বড় বড় করে তখন ও বলল, বইয়ের পাতা ছিঁড়লে কি তোমার হাত ছিঁড়ে পড়ে যাবে আম্মু?

বললাম, আম্মুর হাত ছিঁড়ে যাবে না, আম্মু মারাও যাবে না; কিন্তু মনে অনেক কষ্ট পাবে। আম্মুর চোখ কান্নাও করতে পারে।

করুণ স্বরে ও তখন বলল, আমি চাই না, তোমার মন কষ্ট পাক, তোমার চোখ কান্না করুক। এরপর থেকে আর কোনোদিন সে আমার বই ধরে না, ধরলেও ছেঁড়ে না। বাসায় ওর বন্ধুরা এলে আগেই সাবধান করে দেয়, যেন ওরা কেউ বইয়ের সেলফের কাছে না যায়। এভাবে বইয়ের যতটুকু যত্ন নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব, সে তা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

আমার বাসায় যেহেতু অনেক বাচ্চা আসে, তাই তাদেরকে বোঝানোর দায়িত্ব আমি আমার ছেলেকেই দিয়েছি। বন্ধুরা আসার পর নিজেই বুঝিয়ে বলে, কিচেনে যাওয়া যাবে না, কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করলে আম্মুর কাছে চাইতে হবে, ওয়াশরুমে গিয়ে কোনো কিছু নোংরা করা যাবে না, খেলনা ছাড়া অন্য কোনো কিছু অনুমতি ছাড়া ধরা যাবে না ইত্যাদি। এর ফলে আরেকটা ব্যাপার ঘটে, সেটি হলো, এই কাজগুলো সে অন্য কারও বাসায় বেড়াতে গেলেও করে না।

আসলে বাচ্চাদেরকে যদি প্রতিটি জিনিসের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলা যায়, তাহলে তারা বোঝে এবং মেনে চলার চেষ্টা করে। বন্ধুরা বাসায় এলে তাদের সাথে কোন কোন খেলনা দিয়ে খেলবে, কোথায় বসে খেলতে হবে, কোন কোন জিনিস ধরা যাবে না, কোন কোন কাজ করা যাবে না ইত্যাদি বিষয় বাচ্চাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে হবে, যেন বাচ্চারাই নিজেদের করণীয়-বর্জনীয় বোঝে এবং তা মেনে চলতে পারে।

বিষয়টা একটু কঠিন, তবে বাবা-মা ধৈর্য ধরে চেষ্টা করতে থাকলে ধীরে ধীরে বাচ্চারা এসব রপ্ত করে ফেলতে পারে। এর মাধ্যমে বাবা-মাও মুক্ত থাকতে পারেন অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের সম্মুখীন হওয়া থেকে।

একটু বুকে টেনে নাও না মা!

মায়ের সাথে রাস্তায় সিগন্যাল পার হচ্ছিল ছয় বছর বয়সি বাচ্চাটি। হাতে ছিল দুটি বই। ছোট মানুষ, তাই কৌতূহলী চোখে বিভিন্ন দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে বইগুলো পড়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির দিকে একবার আর অসহায় চোখে মায়ের দিকে আরেক বার তাকাল সে। মা তাকে টেনে উঠিয়ে রাস্তা পার করেই ধমক দিয়ে বললেন, কতবার বলেছি তোমাকে, রাস্তা পার হওয়ার সময় সাবধানে চলতে? যদি গাড়ি চলা শুরু করত? আর যদি কখনো এমন

শিশুদের মনে আল্লাহর অবস্থান

নাকীবের যখন ছয় বছর বয়স, একদিন ওর হাতে মোবাইল দিয়ে আমি রান্না করতে গেলাম। কিছুক্ষণ পর শুনি ও উচ্চৈঃস্বরে বলছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। একটু পর আবারও একই সুর শুনলাম। আরও দুবার শুনে আমি রান্নাঘর থেকে ওর রুমে গিয়ে বললাম, কী হয়েছে বাবা, তুমি বারবার 'বিসমিল্লাহ' বলছ কেন?

নাকীব বলল, আম্মু, তুমি না বলেছ, আল্লাহর নামে কিছু শুরু করলে তাতে বরকত হয়! আমি মোবাইল দেখতে গিয়ে বিসমিল্লাহ পড়ছি। ওর উত্তর শুনে আমি হেসে আবার কাজে ফিরে গেলাম।

এর কিছুদিন পরের কথা। নাকীবকে আমি 'যা কিছু চাওয়ার, আল্লাহর কাছে চাইতে হবে'—বিষয়টি মাত্র বোঝাতে শুরু করেছি। একদিন ওর প্রিয় একটা খেলনা ও খুঁজে পাচ্ছিল না। আমাকে এসে বললে আমি বললাম, আগে নিজে খুঁজে দেখো, একান্তই না পেলে আম্মু সাহায্য করবে। সে মুখটা বাদলা আকাশের মতো করে চলে গেল। একটু পর শুনি ও চিৎকার করে বলছে, 'গ্রাসিয়াস আল্লাহ', 'গ্রাসিয়াস আল্লাহ' (ধন্যবাদ আল্লাহ)। জানতে চাইলাম, কী হয়েছে?

বলল, তুমি তো আমাকে খেলনা খুঁজে দিলে না। আমি আল্লাহকে বলেছি, হে আল্লাহ, আমার খেলনাটা খুঁজে দাও। আল্লাহ তখন আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, আমি ওটা বন্ধুদের দেখানোর জন্য স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই খেলনাটা আমার স্কুলব্যাগের মধ্যে আছে।

নাকীবের স্কুলে এই মাসের প্রথম সপ্তাহে বেশ বাজে একটা ঘটনা ঘটেছে। যখন ধর্মশিক্ষা ক্লাস হয়, তখন মুসলিম বাচ্চাদের জন্য এডুকেশনাল গেমসের একটা আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। নাকীবদের ক্লাসে যে ছয়জন মুসলিম বাচ্চা আছে,

ওরা ধর্মশিক্ষা ক্লাসের সময় তাদের জন্য নির্ধারিত ক্লাসে গিয়ে খেলা করছিল। এক শিক্ষক এসে কথাপ্রসঙ্গে তাদের বললেন, সৃষ্টিকর্তা বলে আসলে কিছু নেই। এসব মানুষের বানানো ধারণা। এগুলো বিশ্বাস করা বোকামি ছাড়া কিছু না। বাচ্চারা সবাই শিক্ষকের এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করল। নাকীব বলল, আপনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস না রাখতেই পারেন, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের আল্লাহ আছেন। এই কথা শেষ করে সে সুরা ইখলাস তিলাওয়াত শুরু করে দিল।

ঘটনাটা নিয়ে মুসলিম অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। স্কুলের টিচার কখনোই বাচ্চাদেরকে এই কথা বলার অধিকার রাখেন না, সৃষ্টিকর্তা বলে আসলে কিছু নেই। এ ধরনের কথা টিচারদের বলার কথাও নয়। তিনি কেন বলেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য গতকাল আমরা অভিভাবকরা একত্রিত হয়েছিলাম। আলোচনার সময় আমাদের সাথে বাচ্চারাও ছিল। আমার এই কথাগুলো লিখতে বসার কারণ আসলে বাচ্চারাই। শিক্ষক কেন 'আল্লাহ নেই' বললেন, এ নিয়ে বাচ্চারা ভয়ংকর রকম রাগান্বিত হয়ে আছে। একটা ছেলে আছে—নাম নোমান। মরক্কোর অধিবাসী। নোমানের ক্ষোভ-ভরা কণ্ঠ, রাগে জ্বলজ্বল করতে থাকা চোখ, প্রতিবাদী অঙ্গভঙ্গি থেকেই আমার এই লেখার সূত্রপাত।

আমি অবাক হয়েছি, আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর নোমানের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের প্রকাশ দেখে। আট বছর বয়সি একটা বাচ্চা যে যুক্তির প্রয়োগ জানে না, প্রতিবাদী কণ্ঠে সে বলছিল—

এটা কি কখনো সম্ভব নাকি, আল্লাহ নেই? আল্লাহ না থাকলে আমরা এলাম কী করে? পৃথিবী সৃষ্টি হলো কীভাবে? আমাদের স্যার বোকা, তাই এমন কথা বলেছেন। অভিভাবকদের মধ্যেও নোমানের আম্মু সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত ছিলেন। সব অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে সবাইকে একত্রিত করার উদ্যোগটিও নিয়েছিলেন তিনি। রাগে লাল হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। বলছিলেন, কোন সাহসে শিক্ষক আমাদের বাচ্চাদের এই কথা বললেন? আমরা স্কুলে পড়াশোনা শেখাতে পাঠিয়েছি, তাদের কাজ শুধু সিলেবাসের সেসব বা সিলেবাস-সমর্থিত বিষয়াবলি শেখানো। 'আল্লাহ আছেন কি নেই', সেটা আমরা শেখাব আমাদের বাচ্চাদের। আমরা সবাই অভিযোগ করলে স্কুল-কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষককে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হবেন।

মা-ছেলের প্রতিবাদে গমগম করছিল গোটা আয়োজন। একজন অভিভাবক বললেন, ভুল করে হয়তো বলে ফেলেছে, এটাকে এত বড় ইস্যু করার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। লক্ষ করলাম, তার বাচ্চাটাও বেশ নির্লিপ্ত এই ব্যাপারে। ওর কাছে ঘটনা জানতে চাওয়া হলে ঠিকমতো বলতেও পারল না। কারণ বিষয়টা ওর মনে তেমন কোনো আঁচড় কাটেনি।

খুব অসহায় লাগে যখন

জন্মের পর থেকেই আমার ছেলে আমাকে পর্দা করতে দেখেছে। একটু বড় হওয়ার পর ও যখন জানতে চাইল, আমি কেন পর্দা করি, বাচ্চাদের ভাষায় ওকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি। ও ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। সমস্যা হয়, যখন পর্দা করে না—এমন কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশী আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে; কিংবা আমরা এমন কারও বাসায় বেড়াতে যাই। তখন ছেলের প্রথম প্রশ্ন থাকে, ওরা কি মুসলিম নয়?

মুসলিম জানার পর চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করে, তাহলে পর্দা করে না কেন? ছোট্ট বাচ্চাকে দ্বীনদারি বহির্ভূত জীবনের কথা কীভাবে বুঝিয়ে বলব, যেন ওর মনে কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে? খুব অসহায় লাগে তখন।

আমরা চেষ্টা করি, হারামমুক্ত থাকতে এবং মাকরুহ পরিহার করে চলতে। কিন্তু সামাজিকতা রক্ষার্থে এমন অনেক দাওয়াতে যেতে হয়, যেখানে মেজবানরা এসব বিষয় খেয়াল রাখেন না। বুঝিয়ে বলতে গেলে বলেন, এত বেছে চলতে চাইলে ইউরোপে থাকার কী দরকার?

ইসলামের বেসিক যাদের জানা নেই, তাদের কীভাবে বোঝাই! যখন নাস্তা দেয়, তখন নিজে বিভিন্ন বাহানা করে এড়িয়ে গেলেও বাচ্চাকে সবার সামনে বাধা দেওয়াটা একটু কঠিন হয় বইকি। আর বাচ্চার প্রশ্ন তো আছেই—তুমি না বলেছ কোক খাওয়া যাবে না, তাহলে ওরা খাচ্ছে কেন? এই কোকটা তো ওরা খাচ্ছে, তুমি তাহলে আমাকে কিনে দাও না কেন? কৌশলী অবস্থা চলে গিয়ে তখন অসহায়ত্ব ঘিরে ধরে মনকে।

মেহমানরা আসার সময় এমন অনেক খাবার নিয়ে আসে, যেগুলোতে ই-কোড দেওয়া থাকে, এমনকি অ্যালকোহলযুক্ত চকলেট পর্যন্ত নিয়ে আসে অনেকে। সেসব না খাওয়া যায়, না কাউকে দেওয়া যায়। ফেলতে গেলে পৃথিবীর লক্ষ

কোটি অনাহারী মানুষের চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কৌশল করে তখন ভবঘুরেরা যেখানে বসে থাকে, তার আশেপাশে কোথাও রেখে আসি। কিন্তু মনের মধ্যে খচখচ করতেই থাকে। হিকমাহর ভুল প্রয়োগ করলাম না তো? একরাশ অসহায়ত্ব আবারও হানা দেয় মনে। যখন কারও বাসায় বেড়াতে যাই এবং সেখানে গিবত, পরচর্চা, পরনিন্দা ও অন্যের নামে সমালোচনার নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে হয়, খুব খারাপ লাগে তখন। কারণ এসব শোনাও তো পাপ! এগুলো থেকে মুক্ত থাকতে গিয়ে ধীরে ধীরে সামাজিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, যার ফলে নিজে যে সামান্য জ্ঞানার্জন করছি, তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা পালন করতে পারছি না। পাপ থেকে বাঁচতে গিয়ে পুণ্য করা থেকেও মাহরুম থাকতে হচ্ছে। সমাধান খুঁজতে গিয়ে যা পাই, তার নাম অসহায়ত্ব।

আমার আট বছরে পা দেওয়া ছেলেটাও আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়ে। মাঝে মাঝে বাসায় এমন কিছু আত্মীয় আসেন বা আমরা এমন কিছু মানুষের বাসায় যাই, যাদের চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু থাকে না। নামাজের জামাত হচ্ছে দেখেও নির্বিকার বসে থাকেন। যে বাচ্চাটাকে আমি বুঝিয়েছি, একজন মুসলিম সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় কখনোই নামাজ বাদ দিতে পারে না, তার অবাক দৃষ্টি আর প্রশ্নের বাণ তখন তির হয়ে বিদ্ধ করে আমার মনকে।

আমরা যারা ইসলামের আলোকে বাচ্চাদের গড়ে তুলতে চাই, তাদের সবারই মনে হয় এ ধরনের অসংখ্য অসহায়ত্ব অনুভব করতে হয়। আমরা তখন বাচ্চাদের বয়স এবং বোঝার ক্ষমতাকে খেয়ালে রেখে তাদের প্রশ্নের অসম্পূর্ণ জবাব দিতে চেষ্টা করি। বাচ্চাদের অবুঝ মন আমাদের নানা কৌশলের কাছে পরাস্ত হলেও আমাদের বিবেকজুড়ে বিরাজ করে অসহায়ত্বের ঘন মেঘ। এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে করতে মনে হয়, আমার অন্তরে তাকওয়া নেই বলেই হয়তো এত অসহায়ত্ব সেখানে জায়গা করে নিতে পারে। করণীয় জেনেও তাই 'কী করব, কী করব' ভেবে দুশ্চিন্তায় ভুগি।

তাকওয়া শব্দের অর্থ 'আল্লাহভীতি'। কিন্তু সেদিন এক তাফসির পড়লাম, যেখানে কুরআনের একটি বিশেষ আয়াতে তাকওয়ার অর্থ 'আল্লাহভীতি'-এর পরিবর্তে 'আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন' অনুবাদ করা হয়েছে। এ অনুবাদের সপক্ষে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে 'ভয়' শব্দটি কোনো কিছু থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতাকেই বোঝায়। ভীতিকর বস্তু বা ব্যক্তি থেকে সবাই নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে চেষ্টা করে। তাই তাকওয়ার অনুবাদ 'ভয়' শব্দে করা অনুচিত। কারণ তাকওয়া শব্দের মর্ম তখন হয়ে যায়—আল্লাহর নিকট থেকে বান্দার দূরে থাকার চেষ্টা। মূলত 'আল্লাহভীতি' শব্দের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে খুশি